বহির্বাণিজ্য ঃ এসময় বণিকরা বাণিজ্যপোতে পণ্যসামগ্রী সজ্জিত করে চোলরাজ্য থেকে শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচিন, চিন প্রভৃতি দেশে নিয়মিতভাবে গমনাগমন করতেন। পূর্ব উপকূলস্থ বিশাখাপত্তনম্ (কুলোতুঙ্গ চোলপত্তনম নামেও পরিচিত স্থানটি), মহাবলীপুরম, নাগপট্টিনম্, শালিয়ুর ও কোরকৈ বন্দররূপে গুরুত্ব লাভ করে, পশ্চিম উপকূলের কুইলোন ও কালিকটও প্রসিদ্ধি অর্জন করে। দূরদেশগামী পূর্বাভিমুখী বাণিজ্য পোতগুলি শ্রীলঙ্কা ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এবং পশ্চিমাভিমুখী বাণিজ্য জাহাজগুলি লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপে বিশ্রাম করত। চৈনিক ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় দক্ষিণ ভারতীয় একটি প্রতিনিধি দল ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে চিনে গিয়ে উপস্থিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির সঙ্গে চোলরাজ্যের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। প্রথম রাজরাজ ও তাঁর পুত্রের রাজত্বকালে ও তাঁদের সহযোগিতায় শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা সংগ্রামবিজয়তুঙ্গ বর্মা নাগপট্টিনমে চূড়ামণিবিহার নির্মাণ করেন। এই উপলক্ষ্যে শৈলেন্দ্ররাজ্য থেকে এক প্রতিনিধি দল বিবিধ উপঢৌকন সহ নাগপট্টিনমে উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুমান করা হয় দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে শুধু সাংস্কৃতিক সম্পর্কই নয় বাণিজ্যিক সম্পর্কও উন্নত করতে উভয় পক্ষই আগ্রহী ছিল। বহির্বাণিজ্য চলত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গেও। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর আরব লেখক ইস্তস্রির বর্ণনায় প্রকাশ, ভারত থেকে পারস্য উপসাগরের পূর্বকূলস্থ সিরাফে জ্বালানি কাঠ, স্ফটিক, কর্পূর, মূল্যবান রত্ন, বাঁশ, শিল্পসামগ্রী, আবলুস কাঠ, চন্দন কাঠ, মশলা, সুগন্ধি, ঔষধ ইত্যাদি সামগ্রী রপ্তানি হত। একাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সিরাফ বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং বন্দররূপে কিস দ্বীপ বিকাশলাভ করে।

সে সময় চোলরাজ্যে আরবি ঘোড়ার বিশেষ চাহিদা ছিল। আরব বণিকেরা অশ্ব দক্ষিণ ভারতের বাজারে বিক্রি করতেন।

মুদ্রাব্যবস্থা ঃ চোলরাজারা স্বনামে বা স্ব অভিধায় সোনা, রূপা ও তামার বহু মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। চোলমুদ্রার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষণীয়। প্রথমত চোল মুদ্রায় প্রায়ই ব্যাঘ্র, মৎস্য ও ধনুকের ছবি অঙ্কিত হতে দেখা যায়। মুদ্রায় মৎস্য ও ধনুকের ব্যবহার পাণ্ড্য ও চেররাজ্যে চোল রাজাদের আধিপত্য বিস্তার প্রমাণ করে।

চোল শাসনব্যবস্থা

আদি-মধ্য ভারতের ইতিহাসে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে দক্ষিণ ভারতের চোল রাজারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। চোল সাম্রাজ্যভুক্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে চোল শাসকেরা এক সুষ্ঠু অথচ দক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। চোল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে প্রধানত ঐ বংশের শাসকদের লেখ

Scanned by CamScanner

থেকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উত্তরমেরুর লেখ, তাঞ্জোর লেখ, তিরুবালঙ্গাড়ু তাম্রশাসন, কাঞ্চীপুরম লেখ ও লেইডেন তাম্রশাসন। এছাড়াও সমসাময়িক মুদ্রা এবং শিল্প ভাস্কর্য থেকেও আমরা উন্নত চোল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি। তৎকালীন সাহিত্যও এ বিষয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চৈনিক লেখক চৌ-জু-কুয়া প্রমুখের রচনায় ও আরব গ্রন্থকারদের বিবরণ থেকেও চোল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

চোল রাজতন্ত্র ছিল অসংখ্য প্রাসাদ, কর্মচারী ও বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ। এই কারণে কে. এন. শাস্ত্রী বাইজানটাইন রাজতন্ত্রের সঙ্গে চোল রাজতন্ত্রের তুলনা করেছেন। রাজ্যাভিষেক ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। অসংখ্য নর্তকীর উপস্থিতি ছিল রাজকীয় ভোজসভার অন্যতম আকর্ষণ।

কেন্দ্রীয় শাসন ঃ চোল রাজ্য ছিল এক রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাজপদ সাধারণত পুরুষানুক্রমিক ছিল। জেষ্ঠ্যপুত্রই পিতার স্থলাভিষিক্ত হতেন। তবে কখনও কখনও যোগ্যতার ভিত্তিতে জেষ্ঠ্যত্বের ভিত্তিতে নয়, রাজার কনিষ্ঠ পুত্র বা অনুজ উত্তরাধিকারী বা যুবরাজ মনোনীত হতেন। চোল প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বশীর্ষে ছিল রাজার অবস্থান। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারক এবং সমরবিভাগের সর্বাধিনায়ক। প্রথম যুগের অনাড়ম্বর রাজতন্ত্র পরবর্তী যুগে আড়ম্বরপূর্ণ হয়েছিল। চোল রাজাদের সাড়ম্বর অভিধার প্রতি অপরিসীম আসক্তি ছিল। যেমন—প্রথম পরান্তক 'বীর চোল', 'ইরিমুডি চোল', 'বীরকীর্তি', 'বীরনারায়ণ', 'দেবেন্দ্রন', 'চক্রবর্তী', শূরচূলমণি', 'দানতোঙ্গ', 'মধুরান্তক' ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত ছিলেন। প্রথম রাজেন্দ্র চোল 'মুডিগোন্দ চোল', 'পণ্ডিত-চোল', 'গঙ্গৈকোন্ড-চোল' ইত্যাদি অভিধায় অলংকৃত হয়েছিলেন।

সুষ্ঠ ও উন্নত প্রশাসন ছিল চোলযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শতাধিক বছরের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই প্রশাসন গঠিত হয়েছিল। চোল শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় এই তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে ছিল রাজার স্থান। রাজা যেসকল মৌখিক আদেশ দিতেন সচিব ও অমাত্যরা তা লিখে নিত। রাজার আদেশ সংকলন করে কর্মচারীর সহি সহ মন্দির বা প্রকাশ্য স্থানে তা টাঙিয়ে দেওয়া হত।

যুবরাজ ঃ রাজা ও যুবরাজের দ্বৈত শাসন চোল রাজতন্ত্রের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রাজা ও যুবরাজ একযোগে লেখ উৎকীর্ণ করতেন না। স্বতন্ত্রভাবে লেখ উৎকীর্ণ করতেন। সমকালীন লেখমালায় রাজা ও যুবরাজের পারস্পরিক দায় দায়িত্বের সীমারেখা আভাসিত হয়নি। রাজা উদ্যমশীল না হলে রাজকার্যে যুবরাজের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেত। এমনটি ঘটেছিল তৃতীয় রাজরাজের রাজত্বকালে। তখন তৃতীয় রাজেন্দ্রই প্রধানত রাজ্য পরিচালনা করতেন।

Scanned by CamScanner

রাজগুরু বা রাজপুরোহিত ঃ চোল লেখমালায় রাজগুরুর উল্লেখ আছে। রাজ্যের এক সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি ধর্মীয় বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ প্রদান করতেন। বিভিন্ন লেখে ঈশানশিব, শর্বশিব, উডেয়ার স্বামিদেরা প্রভৃতি কয়েকজন রাজগুরুর নাম উল্লেখিত হয়েছে। রাজ্য শাসনে রাজপুরোহিতের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

সচিব ঃ সুন্দর চোলের অনাবিল তাম্রশাসনে অনিরুদ্ধ নামে এক ব্রাহ্মণ সচিবের (মান্যসচিব) উল্লেখ আছে। চোল লেখমালায় মন্ত্রীপরিষদের কোনো উল্লেখ নেই।

আমলাতন্ত্র ঃ সাধারণ প্রশাসন ও অন্যান্য কাজে রাজাকে সাহায্য করার জন্য এ পর্বে এক শক্তিশালী ও সুদক্ষ আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব এবং আঞ্চলিক ও সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে তাঁরা চোল শাসনযন্ত্রকে সক্রিয় রাখতেন। চোল সরকারের কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা স্থানীয় কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু তাঁরা স্থানীয় উদ্যোগকে খর্ব করতেন না। সমকালীন লেখে বিভিন্ন শ্রেণির আমলাদের উল্লেখ আছে।

(১) মারায়ন—এই শ্রেণির রাজপুরুষদের উল্লেখ সঙ্গম সাহিত্যে পাওয়া যায়। সঙ্গম সাহিত্যে সামরিক বিভাগের পদস্থ রাজপুরুষরাই তাঁদের পরিচয়। কিন্তু এ পর্বে তাঁরা সাধারণত বেসামরিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। (২) অরৈয়ন—অসামরিক কার্যে নিযুক্ত পদস্থ ছিলেন। (৩) আদিগারিগল—সৈন্যবিভাগ ও সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদস্থ রাজপুরুষ। তখনকার দিনে সামরিক ব্যক্তিরাও প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। (৪) নডুবিরুক্কৈ—জন সংযোগ আধিকারিক, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিচার করা হলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুবিচারের আশায় কোনো পদস্থ রাজপুরুষের শরণাপন্ন হত। (৫) মুগবেট্টি—তাঁরা রাজাজ্ঞা লেখা বা খোদাই-এর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। (৬) পট্টোলৈ—রাজস্ব বিভাগের অধস্তন রাজপুরুষ। মন্দিরের আয় ব্যয় পরীক্ষা করা, মন্দিরের সম্পত্তি যাতে কেউ আত্মসাৎ করতে না পারেন, সেদিকে লক্ষ রাখা তাঁদের কাজ ছিল। (৭) উডনকুট্যম—চোল রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থায় উডনকুট্যম বা রাজার ব্যক্তিগত সহায়কমণ্ডলীর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই সংস্থার সদস্যরা রাজার সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করতেন। অনুমান করা হয় কেন্দ্রের প্রতি বিভাগে একজন করে প্রতিনিধি এই সংস্থার সদস্য ছিল। তাঁরা রাজার সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের সংযোগ রক্ষা করতেন। বিভাগের কাজকর্ম সাফাল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে রাজাকে অবহিত করতেন।

প্রশাসনিক বিভাগ ঃ প্রশাসন কার্যের সুবিধার জন্য রাজার প্রত্যক্ষ শাসনভুক্ত অঞ্চল কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলিকে বলা হত 'মণ্ডলম্' বা প্রদেশগুলিকে 'কোট্টাম' বা জেলায় ভাগ করা হত। কোট্টামগুলি 'নাড়ু' বা অঞ্চলে

Scanned by CamScanner

ভাগ করা হত। নাড়ুর অধীনে ছিল 'কুররম'। কিছু সংখ্যক গ্রাম নিয়ে গঠিত হত 'কুররম'। বড়ো গ্রামকে বলা হত 'আনিয়ুব'।

সাধারণত রাজকুমারদেরকেই মণ্ডলের শাসক নিযুক্ত করা হত। মণ্ডলের অধিপতিকে বলা হত 'মণ্ডলেশ্বর'। তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল কেন্দ্রের অনুশাসন মান্য করা এবং মণ্ডলের যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে রাজাকে অবহিত করা। মণ্ডলের অধীনে নিযুক্ত থাকতেন একজন কর্মচারী। প্রদেশগুলি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়ী ছিলেন। প্রাদেশিক কর্মচারীদের অধীনে ছিল বহু কর্মচারী।

রাজস্ব বিভাগ ঃ সরকারের ভরণপোষণ, সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ, জনহিতকর কার্য সম্পাদন ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার স্বার্থে সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন হত। চোল আমলে ভূমিকর-ই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। ভূমি রাজস্বের হার ছিল সম্ভবত ফসলের $\frac{১}{৩}$ ভাগ অথবা এই ফসলের ভাগের মূল্য। এই কর নগদ অর্থে অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে দেওয়া যেত। এছাড়া আমদানি রপ্তানি শুল্ক, নগরে প্রবেশ কর, শিল্প ও খনি থেকে গৃহীত রাজস্বও আয়ের উৎস ছিল। যুদ্ধ, মন্দির নির্মাণ, বন্যা প্রতিরোধ প্রভৃতির জন্য অতিরিক্ত কর ধার্যের রেওয়াজ ছিল। প্রতি গ্রামে মন্দির শ্মশান প্রভৃতি কিছু স্থান করমুক্ত হিসাবে থাকত। জমির মালিকানা ছিল ব্যক্তির অথবা গ্রাম সম্প্রদায়ের। গ্রামের রাজস্ব আদায়ের জন্য গ্রামসভা দায়ী থাকত। পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সরকারকে উগ্গাপার পোন নামে এক প্রকার কর দিতে হত। সরকারি পুষ্করিণী ব্যবহারের জন্য গ্রাম বা নগরবাসীদের শুল্ক (এসি ঈবু) দিতে হত। কডমৈ ছিল এক ধরনের শুল্ক। আয়ম একধরনের রাজস্ব। কখনও কখনও অপরাধীদের উপর জরিমানা ধার্য হত।

রাজস্ব সংগ্রহের সময় কখনও কখনও বলপ্রয়োগ করা হত। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে একবার রাজস্ব সংগ্রহের সময় সৈন্যরা মহেন্দ্রমঙ্গলম্ ব্রহ্মদেয় গ্রামের সভাসদস্যদের নানাভাবে পীড়ন করেন। অত্যাচারের সহ্যসীমা অতিক্রম করলে সদস্যরা তাঞ্জাভুরে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং তাঁদের দুর্দশার বিষয়টি তাঁর গোচরে আনেন।

বিচার ব্যবস্থা ঃ ছোটো খাটো বাদ বিসংবাদ স্থানীয় অঞ্চলেই মিটিয়ে ফেলা হত। এবিষয়ে গ্রামসভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সভা একটি বিশেষ কর্মচারী উপসমিত গঠন করত। এই কর্মচারী উপসমিতির সদস্যদের নায়ত্তার বলা হত। এ বিচারে সন্তুষ্ট না হলে অভিযুক্ত বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বিষয়টি নাড়ুর ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষদের গোচরে আনতেন।

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার একই আদালতে হত। রাজ্যে গোরু চুরির প্রাদুর্ভাব ছিল। এজন্য মামলা হত। বিচারের কাজ সাধারণত স্থানীয় ভাবে করা হত।

Scanned by CamScanner

চোল রাজারা গ্রামের বিচার ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা চালাতেন। ধর্মীয় শপথ দ্বারা বিচার অথবা সাক্ষ্য ও আইনের দ্বারা উভয় প্রকারের বিচার হত। রাজকীয় আদালতের নাম ছিল 'ধর্মাসন'। যে সব বিচারের জন্য ধর্মাসনে আনা হত সেসব বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহারবিদ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের সাহায্য নেওয়া হত। লেখমালায় এ শ্রেণির ব্রাহ্মণদের ধর্মাসন ভট্টরূপে আখ্যাত করা হয়েছে। বিচার সভায় বাদী প্রতিবাদী পক্ষ নিজেরাই স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করতেন। কোনো মধ্যবর্তীর সাহায্য গ্রহণ করা হত না।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চিনা লেখক চৌ-জ-কুয়া চোলরাজ্যে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন, লঘু অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তিকে কাষ্ঠদণ্ডে বেঁধে ৫০, ৭০, অথবা ১০০ বার লাঠির আঘাত করা হত। গুরুত্ব অপরাধের জন্য অপরাধীদের শিরশ্ছেদ করা হত। লেখমালায় অবশ্য এ ধরনের শাস্তির উল্লেখ নেই। লেখে বর্ণিত চিত্র বাস্তাবানুগ হলে বুঝতে হবে চোল রাজ্যে শাস্তিদান ব্যবস্থা অতিশয় লঘু ছিল।

সেনাবাহিনী ঃ চোল শিলালেখ থেকে জানা যায় ৭০টি রেজিমেন্ট নিয়ে চোল সেনাবাহিনী গঠিত ছিল। বিশেষ করে কেরালা থেকে সেনা সংগ্রহ করা হত। মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। চোল রাজগণের অধীন এক বিশাল স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল। এই বাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল—পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনী। যুদ্ধবিদ্যা শেখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। সৈন্যদের শিক্ষাশিবির ছিল। সমরনায়কগণ 'নায়ক', সেনাপতি 'মহাদণ্ডনায়ক' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। চোল রাজারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। শত্রুর দেশের সাধারণ নাগরিকের ঘরবাড়ি লুঠ, নারী হরণ, সম্পত্তি লুণ্ঠন ছিল চোল যুদ্ধ নীতির অঙ্গ। সেনাবাহিনী অসামরিক কাজে দান ধ্যান প্রভৃতিতেও অংশ নিত।

স্থানীয় বা গ্রামীণ প্রশাসন ঃ রাষ্ট্রবিন্যাসের ভিত্তি ছিল গ্রাম। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্নে ছিল স্বশাসিত গ্রাম। এছাড়া গ্রামে রাজা বা রাজপুরুষদের একটা কর্তৃত্ব ছিল ঠিকই তবু গ্রামের সাধারণ প্রশাসন শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, জমির শ্রেণিবিভক্তিকরণ, রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ এবং আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের দায়িত্ব প্রধানত গ্রামবাসীদের স্কন্ধেই ন্যস্ত ছিল। কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে বলা হত 'কুররম্' বা 'নাড়ু' বা 'কোট্টাম'। বড়ো গ্রামগুলিকে বলা হত 'তনিয়ূর', কয়েকটি 'কুররম্' নিয়ে গঠিত হত 'বলনাড়ু'। বলনাড়ুর উপরে ছিল প্রদেশ বা মণ্ডলম্।

চোল রাজ্যে সাধারণভাবে চার শ্রেণির গ্রাম ছিল। এসব গ্রামে ব্রাহ্মণদের বাস ছিল না। এই গ্রামগুলো ছিল সাধারণ বা পুরানো শ্রেণির। কোনো কোনো গ্রাম ছিল অগ্রহার বা মঙ্গলম্ শ্রেণিভুক্ত। এ ধরনের বেশিরভাগ গ্রামই রাজপ্রদত্ত। ব্রাহ্মণকে

Scanned by CamScanner

ভূমিদান তখন পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। পূর্বতন মালিকদের নিকট থেকে জমি ক্রয় করে সে জমি অগ্রহাররূপে ব্রাহ্মণদের দান করা হত। এর ফলে জমি বেশি দামে বিক্রি হত। স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে প্রচুর অর্থাগম হত। বিক্রিত জমি এজমালি সম্পত্তি হলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রামের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করা হত। গ্রামের উন্নতি ঘটত। তাছাড়া আর এক ধরনের গ্রাম ছিল যেখানে মুখ্যত ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যোপজীবীরাই বসবাস করতেন। গ্রামগুলি বিভক্ত ছিল পাড়ায়। প্রতিটি পাড়ায় নিজস্ব পরিষদ থাকত। এই পরিষদের সভ্যদের মধ্যে পেশাদার কারিগর, যেমন—ছুঁতোর, কামার, তাঁতি, প্রমুখের প্রতিনিধি থাকত। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর পারস্পরিক সুসম্পর্ক ছিল গ্রামজীবনের ভিত্তি। (১) সাধারণ পরিষদ ছিল তিন ধরনের কর প্রদানকারী সভা 'ঊর'। (২) গ্রামের ব্রাহ্মণদের নিয়ে গঠিত বা ব্রাহ্মণদের দান করা গ্রামের সভা—'পরিষদ'। (৩) বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির নিজস্ব পরিষদ 'নগরম্'। কোনো কোনো গ্রামে 'ঊর বা 'সভা দুটোই থাকত। আবার বড়ো গ্রামগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী দুটি ঊর থাকতে পারত।

ঊর বা সভা ঃ গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছিল ঊরের সদস্য। কখনও কখনও একটি গ্রামে দুটি ঊর থাকত। প্রতি ঊরে একটি শাসন পরিচালনা বিভাগ থাকত। গ্রামের মাথাপিছু খাজনা ধার্য, আদায়, বাঁধ তৈরি, খাল খননের সিদ্ধান্ত গ্রাম সভা বা ঊর-এ নেওয়া হত। গ্রামের লোকেদের বিবাদ বিসংবাদের নিষ্পত্তি ঊরে করা হত। চোল আমলে দুই জাতীয় গ্রামসভা ছিল 'ঊর' এবং 'মহাসভা' বা 'সভা'। ঊর যে কোনো গ্রামের আর মহাসভা ব্রহ্মদেয় বা ব্রাহ্মণবসতির। যারা এর সদস্য মনোনীত হতেন, তাঁদের ভিতর থেকে আবার বাছাই করে তিরিশটি ওয়ার্ডের জন্য তিরিশজনকে গ্রহণ করা হত। এই তিরিশ জনের মধ্য থেকে আবার কয়েকজনকে নিয়ে বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করা হত।

সভা অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ সভা বিভিন্ন সমিতি বা ঊর ও ব্রাহ্মণসভা নিয়ে গঠিত ছিল। উত্তরমেরুর লিপি থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন কুড়ুম্ব বা পাড়া থেকে সমিতি গঠনের জন্যে যোগ্য লোকদের মনোনীত করা হত। যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল বেশ উঁচু যথা নিজের বাড়ি, ৩৫-৭০ বয়স, শাস্ত্রজ্ঞান, কিছু জমির মালিকানা প্রভৃতি না থাকলে নির্বাচিত হওয়া যেত না। নৈতিক চরিত্র নির্মল না হলে সমিতির টাকা, বাড়ি আগে তছরুপ না করলে, পণ্যদ্রব্য অপহরণের অপবাদ না থাকলে তবে প্রার্থী হিসাবে যোগ্য মনে করা হত। তারপর এই সদস্যদের দ্বারা উদ্যান, সমিতি, পুষ্করিণী সমিতি, স্বর্ণ সমিতি প্রভৃতি গড়া হত।

এই 'সভা' বা 'মহাসভা' গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্যক্তির জমির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারত। এই সভা গ্রামবাসীদের প্রদেয় রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ে সাহায্য

Scanned by CamScanner

করত। অন্য কোনো কাজের জন্য আলাদা কর এই সভা স্থাপন করত। জলসেচ ও পথঘাট রক্ষার দায়িত্ব ছিল এই সভার। রাজস্ব আদায় করে সরকারের কাছে এই সভা জমা দিত। গ্রাম শাসনের সঙ্গে যুক্ত 'মধ্যস্থ' ও 'করণত্তার' নামক দুজন কর্মচারীর উল্লেখ চোলদের লেখতে পাওয়া যায়।

সভা সংক্রান্ত বেশিরভাগ লেখই তোণ্ডৈমন্ডলম্ ও চোলমণ্ডলম্ে আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুমান করা হয় এ দুটি অঞ্চলেই অধিকসংখ্যক অগ্রহার গ্রাম অবস্থিত ছিল। লেখ থেকে আরও জানা যায়, কাঞ্চীপুরমের সন্নিকটে কয়েকটি মঙ্গলম্ গ্রাম গড়ে উঠেছিল।

নগরম্ ঃ নগরম্ ছিল আধা গ্রাম, আধা শহরের বণিকসভা। নগরম্ শব্দটি বহু অর্থবোধক হলেও শিবপুরি নগরম্ বা তক্কোলম্ নগরম্ প্রভৃতি বললে বুঝতে হবে যে নগরম্ বলতে এখানে সভার মতো কোনো প্রাথমিক সংস্থাকে বোঝানো হয়েছে। কাজের দিকে ঊর বা সভার মতোই নগরমের দায়িত্ব ছিল বাণিজ্যোপজীবী অধ্যুষিত গ্রাম বা শহরের প্রাথমিক সংস্থাও 'নগরম্' নামে পরিচিত ছিল।

নাত্তার ঃ প্রতিটি নাড়ুর একটি নিজস্ব সভা ছিল, এর নাম ছিল নাত্তার। জমির শ্রেণিবিন্যাস, ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের দায়িত্ব ছিল এই সংস্থার। নাত্তার কখনও কখনও মন্দিরের পূজারি নিয়োগ করত, জরিমানা ধার্য করত। আবার কখনও কখনও বিচার কার্য সম্পাদন করত।

ঊর বা সভা, নগরম্ তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব সরকারের বিনা হস্তক্ষেপে পালন করত। কিন্তু যদি তারা তাদের নিয়ম পরিবর্তন করত অথবা ভূমি স্বত্বের নিয়ম বদলাত তাহলে রাজকীয় অনুমোদন দরকার হত। এজন্য কেন্দ্রের দায়িত্বশীল কর্মচারীকে সভায় হাজির হতে হত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ কর্মচারীরা ছিল অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবী।

শক্তিশালী নৌবাহিনী ঃ চোল শাসনের অপর গুরুত্ব তাদের নৌ-তৎপরতা। এই নৌবাহিনী ছিল বিশেষ শক্তিশালী। বলা হয় যে, রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোলের শাসনকালে দীর্ঘদিন বঙ্গোপসাগর 'চোল হ্রদে' পরিণত হয়। বিশেষ করে ভারত মহাসাগরের বুকে চোলদের নৌসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এই সাম্রাজ্যকে এক রাজনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তা দিয়েছিল। চোল নৌশক্তির ভয়ে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি, সিংহল, সুমাত্রা, মালয়ের দেশগুলি সন্ত্রস্ত ছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে আরব বণিকদের সক্রিয় প্রতিযোগিতা সম্পর্কে চোলরাজগণ সচেতন ছিলেন।

চোলদের নৌসাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য নেহাৎ কম নয়। ইতিহাসবিদ কে. এম. পানিক্করের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারা যায় যে, চোল আমলে দক্ষিণ ভারতীয় সমুদ্র উপকূল ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় তাদের রাজনৈতিক

Scanned by CamScanner